মুসলিম পার্সোনাল ল' কি ও কেন?

শাম্‌স পীর জাদা

মুসলিম পার্সোনাল ল' কি ও কেন?

শামস পীরজাদা

বাংলা ইসলামী প্রকাশনী ট্রাস্ট
কলকাতা-১৩

প্রকাশক:
বাংলা ইসলামী প্রকাশনী ট্রাষ্ট
২৭ বি লেনিন সরণী
কোলকাতা-৭০০ ০১৩

তৃতীয় প্রকাশ: অক্টোবর, ১৯৯৫
চতুর্থ প্রকাশ: এপ্রিল, ২০১৭
পঞ্চম প্রকাশ: আগস্ট, ২০২১

বিনিময়: ২৫ টাকা

মুদ্রণে: মিমঝিম বুক বাইন্ডিং
কলকাতা-৭০০০০৯

Muslim Personal Law Ki O Keno
by Shams Pirjada
Published by: Bangla Islami Prakasani Trust
27B, Lenin Sarani, Kolkata-700 -013
Printed by: Mimjhim Book Binding
Kolkata-700 009

Price RS. 25/- only

মুখবন্ধ

মুসলিম পার্সোনাল 'ল এর সমস্যাটি মুসলমানাদের সম্মুখে যেভাবে একটি জীবনমরণ সমস্যারূপে প্রতিভাত হয়েছে, এই উপমাহদেশের সমগ্র মুসলিম মানসে এ সমস্যাটি যে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছে, এবংসর্বত্র একটা অস্থিরতা ও উৎকণ্ঠার পরিবেশ সৃষ্টি করেছে, তার জন্য তথাকথিত আধুনিকতার ধারক ও বহিরাগত নতুন সভ্যতার ধ্বজাধারীগণ তাতে বিস্ময়বোধ করেছেন। তাঁদের ধারণা, এ সমস্যাটির উপর অপ্রয়োজনীয় গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে এবং ভারতের মুসলিম জনতার এই মানসিক অস্থিরতার যথার্থই কোনো প্রয়োজন নেই। তাঁরা মনে করেন, মুসলমানদের এই মানসিক অস্থিরতা তাদের রক্ষণশীল মনোবৃত্তি এবং ধর্মের সাথে প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পর্কবোধেরই ফলশ্রুতি। এই সঙ্গে তাঁরা একথাও মনে করেন যে, রাজনীতি অর্থনীতি প্রভৃতি বিভাগকে যেবাবে ধর্ম থেকে স্বাধীন করে দেওয়া হয়েছে অনুরূপভাবে জীবনের সামাজিক দিকগুলিও ধর্মের আওতামুক্ত হওয়া উচিত। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতি জীবনে সেক্যুলারিজমের তথা ধর্মহীনতার যে অপ্রতিহত শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে গৃহস্থালীর চৌহদ্দির মধ্যেও তার প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। এ ধারায় যাঁরা চিন্তা করেন তাঁরা ইসলামকেও অন্যান্য ধর্মের সারিতে দাঁড় করিয়ে দেন। ইসলাম যে খোদা প্রেরিত দ্বীন এবং একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা এ কথা বুঝতে তাঁরা অক্ষম। তাঁদের মতে, ইসলামের সামাজিক বিধিবিধান খোদা প্রেরিত হলেও অবশ্যই তাতে সংশোধনের অধিকার মানুষের থাকা উচিত।

উপরন্তু মুসলিম পার্সোনাল 'ল সম্পর্কে কোনো প্রকার ধারণাই রাখে না এ ধরনের লোকের সংখ্যাও নেহাত কম নয়। এ ধারণায় কিছু লোক মুসলিম পার্সোনাল 'ল-এর সমর্থনে মুসলমানদের সোচ্চার হবার এবং মুসলমানদের এই অধিকারে হস্তক্ষেপ করার প্রচেষ্টার প্রতিবাদ ধ্বনিকে অযথা হৈচৈ ও কান্নাকাটি আখ্যা দিচ্ছেন। তাঁদের মতে, মুসলিম পার্সোনাল 'ল হচ্ছে একাধিক বিয়ে করার স্বাধীনতা সম্পর্কিত একটি আইন মাত্র। তাঁরা বলেন, ন্যায় ও

ইনসাফের শর্ত সাপেক্ষে ইসলাম এক স্ত্রীর বর্তমানে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করার অনুমতি দান করেছে। আর এটি একটি অনুমতিমাত্র, কোনো নির্দেশ নয়। কাজেই একাধিক বিয়ের উপর বিধি-নিষেধ আরোপের আইন প্রণীত হলে ইসলামী শরীয়তের ক্ষতি কিসে? তাঁদের মুসলিম পার্সোনাল 'ল খতম করে দিয়ে ধর্ম ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে একই ধরনের সামাজিক আইন প্রবর্তনে কোনো প্রকার ক্ষতির সম্ভাবনা নেই কেননা তাঁদের মতে বিয়ে শাদীর গুটিকয় বিষয়ের মধ্যেই এ পরিবর্তন সীমাবদ্ধ থাকবে। আসলে এঁরা মুসলিম পার্সোনাল 'ল-এর সীমা সম্পর্কে সঠিক ধারণা রাখেন না এবং একই ধরনের সামাজিক আইন 'ইউনিফর্ম সিভিল কোড' সম্পর্কেও তাঁদের কোনও ধারণা নেই। এঁরা মুসলিম পার্সোনাল 'ল-এর দ্বীনি গুরুত্ব উপলব্ধি করেত পারেননি। এবং একই ধরনের সামাজিক আইন প্রবর্তনের ফলে ইসলামী শরীয়তের কোন্ কোন্ নীতি বিধান সংশোধন ও বিলোপের গ্রাসে পরিণত হবে সে সম্পর্কে কোনও ধারণাই তাঁদের নেই। তাই মুসলিম পার্সোনাল 'ল তার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সুস্পষ্ট করা এবং একই ধরনের সামাজিক আইনের সমর্থকদের যুক্তি পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে যে, যদি একই ধরনের সামাজিক আইন রচিত ও প্রবর্তিত হয়, তাহলে তার কাঠামো ও অবয়ব কী রকম হবে এবং তা মুসলমানদেরকে কোন্ ধরনের সমস্যার আবর্তে নিক্ষেপ করবে? তাই মুসলমানদের এই উৎকণ্ঠা ও অস্থিরতা নিরর্থক নয় বরং তারা যে দ্বীন ও জীবনব্যবস্থার ধারক এবং যার উপর তারা পরিপূর্ণ ঈমান রাখে তার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ও স্বাভাবিক দাবি মাত্র।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মুসলিম পার্সোনল 'ল কী?

ভারতে মুসলিম পার্সোনাল ল'-এর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, মোগলদের শাসনামলে ইসলামী অইনই ছিল দেশের আইন (Law of the Land)। অর্থাৎ কেবল সিভিল আইনই নয়, ইসলামের ফৌজদারী আইনও (Criminal Law) দেশে প্রবর্তিত ছিল এবং সে অনুযায়ী আদালতসমূহ পরিচালিত হতো। তবে অমুসলিমদের বিয়ে-শাদী, উত্তরাধিকার ও সম্পদ-সম্পত্তি বন্টন প্রভৃতির ক্ষেত্রে নিজেদের ধর্মীয় ও প্রচলিত আইন অনুযায়ী জীবনযাপন করার ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বধীন ছিল। অর্থাৎ তাদের জন্য ছিল তাদের নিজেদের পার্সোনাল ল' আর মুসলমানদের জন্য ছিল মুসলমানদের নিজেদের পার্সোনাল ল'। ১৭৬৫ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আদালতসমূহ পুনর্গঠিত করেন। ইংরেজ জজগণ আইনজ্ঞদের সহায়তায় ইসলামী আইন অনুযায়ী ফায়সালা করতে থাকেন। পরে ধীরে ধীরে ইংরেজি আইন জারি হতে থাকে। এভাবে ১৮৬২ সালে ইসলামী ফৌজদারী আইন (Criminal Law) বাতিল করে দিয়ে তদস্থলে ইন্ডিয়ান পেনাল কোড (Indian Penal Code) যা আজও এই নামে প্রচলিত— প্রবর্তন করা হয়। এই সঙ্গে বিয়ে তালাক, মীরাস, হেবা প্রভৃতি সামাজিক ও ব্যক্তিগত বিষয়াবলীতে ইসলামী আইন অপরিবর্তিত রাখা হয়।[১] কিন্তু অনৈসলামী সভ্যতাসংস্কৃতির প্রভাবাধীনে মুসলমানদের কোনও কোনও গ্রুপের মধ্যে প্রচলিত আইন ইসলামী আইনের স্থান গ্রহণ করে। যেমন হিন্দু সংস্কৃতির প্রভাবাধীনে মেয়েদেরকে মীরাসের অংশ দেয়া হতো না।

১ / *Chamber's Encyclopedia Vol. IX. P. 468*

তাই আলেম সমাজ ও সচেতন মুসলিম জনতার দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ইংরেজদের শাসনকালে ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম পার্সোনাল ল' Muslim Personal Law (Shariat) Application Act ১৯৩৭-এর প্রবর্তন কার্যকরী হয়।

অতঃপর ১৯৩৯ সালে মুসলিম বিবাহ বিচ্ছেদ আইন Dissolution of Muslim Marriages Act ১৯৩৯ প্রবর্তিত হয়। এই আইনে একজন মুসলমান মহিলা যে সমস্ত কারণের ঝদ্রন্ড:ত্মন্ু ভিত্তিতে তার স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হবার জন্য আদালতের শরণাপন্ন হতে পারে সেগুলি চিহ্নিত করা হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, যদি স্বামী চার বছর থেকে নিরুদ্দেশ থাকে বা দু'বছর থেকে খোরপোষ আদায় করছে না অথবা জুলুম ও নির্যাতনমূলক ব্যবহার করে বা একাধিক স্ত্রীর বর্তমানে তাদের মধ্যে কুরআনের নির্দেশ অনুসারে ন্যায় ও ইনসাফ করে না অথবা মারাত্মক সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হয়, তাহলে এর ভিত্তিতে স্ত্রী আদালত থেকে বিবাহ বিচ্ছেদের ফরমান ঙ্গত্রত্বন্তত্রূ হাসিল করতে পারে।

এ থেকে এ কথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, মুসলিম পার্সোনাল ল' বিয়ে, তালাক, খুলা, মীরাস প্রভৃতি শরীয়তের বিধানসমূহের সাথে সম্পর্ক রাখে এবং এর সীমানা এত ব্যাপক যে, ইসলামের কেবল বিয়ে-তালাকের বিধানই এর মধ্যে পড়ে না বরং সমগ্র মীরাস ব্যবস্থাও এর আওতাভুক্ত। এ সকল বিষয় সম্পর্কিত কোনো ব্যাপারে বিবাদ দেখা দিলে আদালত শরীয়তের আইন অনুযায়ী তার মীমাংসা করতে বাধ্য। যেমন কোনো স্ত্রী স্বামীর জুলুমে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলে এবং স্বামী খুলা-তালাক দিতে রাজি না হলে স্ত্রী আদালতের সাহায্যে বিবাহ-বিচ্ছেদ করতে পারে। অথবা ইসলাম মেয়েদের জন্য মীরাসের যে অধিকার নির্ধারিত করেছে কোনো মেয়েকে যদি তা না দেয়া হয়, তাহলে সে আদালতের সাহায্যে নিজের অধিকার লাভ করতে পারে।

যদিও মুসলিম পর্সোনাল ল' সংকলন (Condification) করা হয়নি তবুও যেহেতু নীতিগতভাবে শরীয়তকে ফায়সালার মাণদণ্ড হিসবে গ্রহণ করা হয়েছে তাই ইসলামী ফিকাহ আইনের মর্যাদা লাভ করেছে এবং আদালতের সুবিধার জন্য ইংরেজি ভাষায় মোহামেডান ল' সম্পর্কে বহু বইপত্র প্রকাশ করা হয়েছে। যেমন মোল্লার Principles of Mohammadan Law এবং এ. এ. ফয়জীর Outline of Mohammadan Law যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। হানাফী ফিকাহর প্রসিদ্ধ প্রামাণ্য গ্রন্থ হেদায়ারও ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করা হয়েছে। এরই বরাত দিয়ে উকিলগণ আদালতের নিকট ফায়সালা দান করার আবেদন জানান এবং আদালতকে ইসলামী আইন অনুযায়ী ফায়সালা দান করতে হয়। স্বাধীনতা লাভের পরও এ পরিস্থিতি অপরিবর্তিত থাকে এবং খোদার অনুগ্রহে এখনও পর্যন্ত আছে। তবে খুটিনাটি ও বিস্তারিত ব্যাপারে বর্তমান আদালত সমূহের মাধ্যমে ইসলামী আইনের উদ্দেশ্য সফল হচ্ছে না, এটি অবশ্য স্বতন্ত্র ব্যাপার। বর্তমান ব্যবস্থায় এ পরিস্থিতিতে এর আশাও করা যেতে পারে না।

মুসলিম পার্সোনাল ল'-এর গুরুত্ব

বিয়ে, তালাক, খুলা, মীরাস প্রভৃতি বিষয়গুলি এমন পর্যায়ভুক্ত নয় যে, এগুলির ব্যাপারে যে কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে। এগুলি সম্পর্কে নিজের ইচ্ছামতো আইন প্রণয়ন করার স্বাধীনতা ইসলাম কাউকে দেয়নি। বরং এগুলির প্রত্যেকটির ব্যাপারে কুরআন মজীদের সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। সেই নির্দেশ বিবৃত করার পর তার আনুগত্য করার জোর তাকীদ করা হয়েছে এবং তার বিরুদ্ধাচারণকারীর প্রতি কঠোর ভীতি ও শাস্তি প্রদর্শন করা হয়েছে। যেমন বিয়ের নির্দেশ বিবৃত করার পর কুরআন মজীদে বলা হয়েছে—

'এটি খোদার আইন, এর আনুগত্য করা তোমাদের জন্য অপরিহার্য'। (সূরা নিসা: ২৪)

তালাক ও খুলার বিধান বিবৃত করার পর বলা হয়েছে:

'এ হচ্ছে আল্লাহ সীমানা, এগুলি লংঘন করো না আর যেসব লোক আল্লাহর সীমানা লংঘন করে তারাই জালেম।' (সূরা বাকারা ঃ ২২৯)

মীরাসের আইন বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ

'এ হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে আরোপিত দায়িত্ব।' (সূরা নিসা ঃ ১১)

যে আয়াতে গিয়ে মীরাসের বর্ণনা শেষ করা হয়েছে তাতে বলা হয়েছে ঃ

''আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নাফরমানী করবে এবং তাঁর নির্ধারিত সীমানা লংঘন করবে আল্লাহ তাকে আগুনে নিক্ষেপ করবেন, তার মধ্যে সে হামেশা থাকবে আর সেখানে তার জন্য থাকবে অবমাননাকর আজাব। (নিসাঃ ১৪)

কোরআন মজীদে যেসব সামাজিক বিধান বিবৃত হয়েছে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেগুলির ব্যাখ্যা করেছেন। সেগুলিকে বলা হয় সুন্নাত। ফিকাহবিদগণ এই কোরআন ও সুন্নাতের আলোকে ইজতিহাদ করে ইসলামী ফিকাহ প্রণয়ন করেছেন। কোরআন ও সুন্নাতের যে সকল বিধান সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের সম্পর্কিত সেগুলি ইসলামী শরীয়তের গুরুত্বপূর্ণ ও অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সেগুলি খোদার আইন ও তাঁর ফরমান অতীব মর্যাদাসম্পন্ন। কোরআন মজীদে পুরোপুরি আনুগত্য করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে—

''হে ঈমানদরাগণ! ইসলামের মধ্যে পুরোপুরি প্রবেশ করো।'' (বাকারা ঃ ২৮০)

"তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের উপর যাকিছু নাজিল করা হয়েছে তার আনুগত্য করো এবং তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য খোদাদের আনুগত্য করো না।" (আরাফ ঃ ৩)

"(হে নবী!) তুমি নাজিলকৃত আইন অনুযায়ী তাদের বিষয়াবলীর মীমাংসা করো এবং তাদের ইচ্ছার আনুগত্য করো না। সাবধান হয়ে যাও, তারা যেন তোমাকে পরীক্ষার মধ্যে নিক্ষেপ করে এমন কোনো কোনো বিধান পালন করা থেকে তোমাকে বিচ্যুত না করতে পারে, যা খোদা তোমার উপর নাজিল করেছেন।" (মায়েদা ঃ ৪৯)

আল্লাহর বিধান ও আইনের উপস্থিতিতে নিজের পছন্দমত আইন প্রণয়ন করার বা নিজের খেয়াল খুশীমত কোনো পথে চলার অধিকার কোনো মুসলমানের নেই ।

"আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ফায়সালা দানের পর কোনো মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীর নিজেদের ব্যাপারে ফায়সালা গ্রহণের আর কোন ইখতিয়ার থাকে না।" (আহযাব ঃ ৩৬)

যারা আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ফায়সালা করে না তাদেরকে কাফের, জালেম ও ফাসেক বলা হয়েছে। অনুরূপভাবে দ্বীনের এক অংশ গ্রহণ করার ও আর এক অংশ পরিহার করার বিরুদ্ধেও কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে।

"তাহলে তোমরা কি খোদার কিতাবের একটি অংশের উপরে ঈমান এনেছো এবং অন্য অংশকে অস্বীকার করছো?" (বাকারা ঃ ৮৫)

সূরায়ে নিসায় বিস্তারিতভাবে সামজিক বিধানসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে। এই সূরায় রসূলুল্লাহকে সা. সম্বোধন করে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা হয়েছে—

"(হে নবী!) তোমার প্রতিপালকের কসম, তারা মুমিন হতে

পারে না যতক্ষণ না তারা নিজেদের পারস্পরিক বিরোধমূলক বিষয়াবলীতে তোমাকে ফয়সালাদানকারী হিসাবে মেনে নেয়, অতঃপর তুমি যে ফায়সালা দান করো তাতে নিজেদের মনে কোনো প্রকার সংকীর্ণতা অনুভব করেনা বরং তোমার ফায়সালা মনে প্রাণে গ্রহণ করে।" (নিসা ঃ ৬৫)

মুসলিম পার্সোনাল ল' বিরোধীরা বলেন, মুসলিম পার্সোনাল ল' শরীয়তের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে তা বিলুপ্ত করা যাবেনা, একথা ঠিক নয়। কারণ ইতিপূর্বে ইসলামের অপরাধ আইন (Criminal Law) শরিয়তের অঙ্গ হওয়া সত্ত্বেও বিলোপ করা হয়েছে। ফলে দেশে এখন অনৈসলামী অপরাধ আইন প্রবর্তিত আছে। বড় অদ্ভুত যুক্তি। যদি কোনো ব্যক্তিকে কোনো কারণে বাধ্য হয়ে অস্বচ্ছ দূর্গন্ধময় বাতাসে নিঃশ্বাস নিতে হয়, তাহলে এর অর্থ কি এই দাঁড়ায় যে, স্বচ্ছ বাতাস লাভ করলেও সে তাতে নিঃশ্বাস নেবে না, তার পথ বন্ধ করে দেবে এবং কেবল দূর্গন্ধময় বাতাসেরই ব্যবস্থা করতে থাকবে? ইসলামের অপরাধমূলক, সামাজিক, পারিবারিক বা অন্য যে কোনো প্রকারের আইনই হোকনা কেন স্বস্থানে তা পরিপূর্ণ গুরুত্বের অধিকারী। ইসলামের সকল প্রকারের আইন সমান মর্যাদার অধিকারী। শরীয়তের যেকোন প্রকারের আইন বিলুপ্ত করার ধারণাই কোনো মুসলমানের মনে আসতে পারেনা। যদি যুগের কোনো এক পর্যায়ে কোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতিতে ইসলামের অপরাধ আইনের পরিবর্তে অন্য কোনো আইন মুসলমানদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়ে থাকে, তাহলে এর ফলে ইসলামী আইনের আর যতটুকু অংশও প্রচলিত ও প্রবর্তিত রয়েছে তাকেও বাতিল করে দেয়ার বৈধতা প্রমাণিত হয়না। এ ছাড়াও এই বিরোধীরা অপরাধ আইন ও সামাজিক আইনের মধ্যকার পার্থক্যের প্রতিও কোনো গুরুত্ব দেননা। অপরাধ আইন মূলতঃ রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কিত। যেমন চোর ও ব্যভিচারীর

শাস্তি দিতে পারে রাষ্ট্র। ব্যক্তিরা বা সাধারণ মানুষ তাদের শাস্তি দিতে পারে না। কিন্তু ব্যক্তিদের নিজস্ব পর্যায়ে সামাজিক আইনকে মেনে চলতে হয় এবং এ ব্যাপারে রাষ্ট্রের সম্পর্ক হচ্ছে গৌণ ও দ্বিতীয় পর্যায়ের। অর্থাৎ এ সম্পর্কিত বিভিন্ন মোকদ্দমার মীমাংসা করা রাষ্ট্রের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। ইসলামের সামাজিক আইন বিলোপ করলে ব্যক্তিদের নিজেদের নৈতিক অবস্থা প্রভাবিত হবার পুরোপুরি সম্ভাবনা দেখা দেয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, রাষ্ট্রীয় আইনে ব্যক্তির তালাক দানের অধিকার বেআইনী গণ্য হবার পরও যদি কোনো ব্যক্তি নিজের স্ত্রীকে তালাক দিয়ে বসে, তাহলে শরীয়তের বিধান অনুযায়ী তার স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে। ন্যায় তার সাথে থাকবে। বলা বাহুল্য এর ফলে পুরুষ ও স্ত্রী উভয়েরই নৈতিক অবস্থা প্রভাবিত হবে। বিপরীতপক্ষে অপরাধ আইন নিছক অপরাধীদের শাস্তি দানের সাথে সম্পর্ক রাখে। তাই ইসলামের অপরাধ আইন প্রচলিত না থাকাকে মুসলিম পার্সোনাল ল' এর বিলোপ সাধনের পক্ষে যুক্তি হিসাবে পেশ করা যেতে পারে না।

ভারতীয় গণতন্ত্রের ৪৪ ধারা

মুসলিম পার্সোনাল ল' পরিবর্তন কারার জন্য দেশে যে আন্দোলন চালানো হচ্ছে, মুসলিম পার্সোনাল ল'কে পুরোপুরি বিলুপ্ত করা এবং তদস্থলে এমন একটি সামাজিক আইন প্রবর্তনের পথ পরিস্কার করা, যা হবে সকল সম্প্রদায়ের জন্য সমান। তাতে মুসলমান ও অমুসলমানের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকবেনা। এবং ইসলাম বা অন্য কোনো ধর্মের পারিবারিক আইন বিলুপ্ত হয়ে যাবে। মূলতঃ পাশ্চাত্য সভ্যতা ও বস্তুবাদী জীবনদর্শনই হচ্ছে এ আন্দোলনের ভিত্তি। কিন্তু ভারীতয় শাসনতন্ত্রের ৪৪ নম্বর নীতি নির্ধারক ধারাটি এর ভিত্তি সরবরাহ করে। ৪৪ নং ধারায় বলা হয়েছে ঃ (The State shall endeavour to secure for citizens a uniform civil code throughout the

territory of India.) "রাষ্ট্র দেশের নাগরিকদের জন্য একই ধরনের সামাজিক আইন প্রবর্তনের চেষ্টা করবে।"

কিন্তু শাসনতন্ত্রের এ ধারাটি অন্যান্য নীতি নির্ধারক ধারাগুলির ন্যায় নিছক একটি নীতি ধারার মর্যাদা রাখে এবং শাসনতন্তের মৌলিক অধিকারসমূহ (Fundamental Rights) অবশ্যই এরই উপর প্রভাবশালী। ঐ মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত ধারাগুলিতে বলা হয়েছে।

"সকল লোক একই ধরনের মানসিক স্বাধীনতা লাভ করবে এবং স্বাধীনভাবে নিজের ধর্ম গ্রহণ করার, সেই অনুযায়ী চলার ও তা প্রচার করার অধিকার লাভ করবে।" (২৫ নং ধারা)

ধর্মীয় স্বাধীনতা সম্পর্কিত এ ধারার পরিপ্রেক্ষিতে এমন কোনো সমাজিক আইনের অবকাশ থাকা উচিত নয় যার ফলে কোনো সম্প্রদায়ের ধর্মীয় স্বাধীনতা বিলুপ্ত হয় এবং তাকে তার ধর্মীয় শিক্ষাবলী বিরোধী কাজ করতে বাধ্য করা হয়। যদি এমন করা হয়, তাহলে তা ধর্মের উপর সুস্পষ্ট হস্তক্ষেপ বলে বিবেচিত থাকবে, শাসনতন্ত্রের এ নিশ্চয়তা বিধানের কি অর্থ হবে? বিস্ময়ের ব্যাপার, শাসনতন্ত্রের এতবড় গুরুত্বপূর্ণ ধারাকে উপেক্ষা করে ৪৪ নম্বর ধারাকেই সবকিছু মনে করা হচ্ছে।

নীতি নির্ধারক ধারাগুলির (Directive Principles) ব্যাপারে বলা যায়, মদ্যপান বন্ধ করার আইন প্রবর্তনও এই নীতি নির্ধারক ধারাগুলির অন্তর্ভূক্ত এবং এ আইন প্রবর্তনের পথে কোনো ধর্মের বাধা নেই। এতদসত্ত্বেও বহু রাজ্যে এখনো এ আইনটির প্রবর্তন সম্ভব হয়নি। আর যেসব রাজ্যে এর প্রবর্তন হয়েছে সেখান থেকেও ধীরে ধীরে এর বিলোপ সাধন হচ্ছে। যেমন কেরালার মদ্যপান বন্ধের আইন রহিত করা হয়েছে। মহারাষ্ট্রে প্রথমে মদ্যপান বন্ধের আইনকে যথেষ্ট শিথিল করে দেয়া হয় এবং বর্তমানে রাজ্য সরকার—এ

আইনের বিলোপ সাধন চাচ্ছেন। শাসনতন্ত্রের একটি নীতি-নির্ধারক ধারাকে উপেক্ষা করার জন্য এভাবে সব রকমের পদ্ধতি অবলম্বন করা হচ্ছে। অথচ অন্য একটি নীতি-নির্ধারক ধারা, যেখানে যথেষ্ট মতবিরোধের অবকাশ রয়েছে এবং প্রবর্তনের ফলে ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ হয়, তার প্রবর্তনের জন্য এভাবে চাপ প্রদান, এ কোন ধরনের ন্যায়-নীতি?

বলাবাহুল্য যতদিন শাসনতন্ত্রের ৪৪ নং ধারা বর্তমান থাকবে ততদিন একই ধরনের সামাজিক আইনের (ইউনিফর্ম সিভিল কোড) আন্দোলন প্রবলতর হতে থাকবে এবং মুসলিম পার্সোনাল ল' মাথার উপর উন্মুক্ত তরবারি ঝুলানো থাকবে। রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল ব্যক্তিগণ মুসলিম পার্সোনাল ল'-এর মধ্যে পরিবর্তন না করার জন্য যতই নিশ্চয়তা দান এবং যতই ওয়াদা করুন না কেন তাতে কিছু আসে যায়না। কারণ রাষ্ট্রের দায়িত্বশীলদের ওয়াদার অবস্থা সবাই জানে।

উপরন্তু আর একটি কারণেও নিশ্চয়তা দান যথেষ্ট নয়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিগণই স্বতঃই পরিবর্তিত হতে থাকেন এবং সরকারের পরিবর্তন হতে থাকে। কাজেই আজ রাষ্ট্রের দায়িত্বশীলগণ যে ওয়াদা করছেন কাল তাঁদের স্থলাভিষিক্তগণ তা পূরণ করবেন এর গ্যারান্টি কোথায়? তাই শাসনতন্ত্রের এ ধারাটির বিলোপ সাধনের প্রয়োজন অত্যধিক অথবা এর মধ্যে এমন সংশোধন প্রয়োজন যার ফলে মুসলিম পার্সোনাল ল' সংরক্ষণের পূর্ণ নিশ্চয়তা লাভ করা যায়।

শাসনতন্ত্র প্রণয়ন পরিষদে যখন শাসনতন্ত্রের ৪৪ নং ধারার উপর আলোচনা চলছিল তখন পরিষদের সদস্যগণ তাতে একাধিক সংশোধনী পেশ করেন। জনাব মুহাম্মদ ইসমাঈল (মাদ্রাজ) এক গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী পেশ করেন। তাতে বলা হয়ঃ

Provided that any group, section or community or people shall not be obliged to give up its own personal Law. In case it has such a law (Directive Principles in the Indian Constitution by K.C. M kandan P. 193)

"কিন্তু জনসাধারণের কোনো গ্রুপ, অংশ বা সম্প্রদায়কে তাদের পার্সোনাল ল' পরিহার করতে বাধ্য করা হবেনা, যদি তারা তেমন কোনো আইনের অধিকারী হয়।"

দ্বিতীয় সংশোধনী পেশ করেন জনাব নাজীরুদ্দিন আহমদ। তাতে বলা হয় ঃ

Provided that the personal law of any community which has been guarented by the state shall not be changed except with the previous approval of the community ascertained in such manner as the Union Legislature may determine by Law. (do page 193)

"কিন্তু রাষ্ট্র কোনো সম্প্রদায়ের যে পার্সোনাল ল' সংরক্ষণের নিশ্চয়তা দান করেছে তার মধ্যে পরিবর্তন করা হবেনা। তবে যদি ঐ সম্প্রদায়ের নিকট থেকে পূর্বাহ্নে মঞ্জুরী লাভ করা হয়, এমন পদ্ধতিতে যা কেন্দ্রীয় আইন প্রণয়ন পরিষদ আইনের মাধ্যমে তার জন্য নির্ধারিত করেছে।"

জনাব নাজীরুদ্দীন আহমদ এই সংশোধনী পেশ করে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন যে, এ ধারাটি (৪৪ নং ধারা) ধর্মীয় স্বাধীনতার ধারার সাথে সংঘর্ষশীল এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা সংক্রান্ত ধারায় যে নিশ্চয়তা দান করা হয়েছে ও ধারাটি (৪৪ নং ধারা) সম্ভবতঃ তা বিলুপ্ত করে দেবে।

তৃতীয় সংশোধনী পেশ করেন জনাব মাহবুব আলী বেগ (মাদ্রাজ)। তাতে বলা হয় ঃ

Provided that nothing in this Article shall affect the Personal Law of the citizen. (do page 193)

"কিন্তু এ ধারাটি নাগরিকদের পার্সোনাল ল'-কে প্রভাবিত করবে না।"

চতুর্থ সংশোধনী পেশ করেন জনাব বি. পোকার সাহেব বাহাদুর (মাদ্রাজ)। তাঁর সংশোধনী জনাব মুহাম্মদ ইসমাঈলের সংশোধনীর অনুরূপ ছিল।

তদানীন্তন আইন প্রণয়ন পরিষদে এ সংশোধনীগুলির ভিত্তিতে তুমুল, আলোচনা ও বিতর্ক চলে। এ আলোচনায় কে.এম.মুন্সী, এম.আর. মাসানী, এ.কে.মুন্সী এতদূর বলে ফেলেন যে—

It was the desire of the framers of the constitution to divorce religion from Personal Law. (do page 195)

"এই শাসনতন্ত্র প্রণেতাগণ পার্সোনাল ল' থেকে ধর্মকে বিদায় দেবার ইচ্ছা পোষণ করতেন।"

তিনি নিজের বক্তৃতায় মিসর ও তুরস্কের সংশোধন প্রচেষ্টার বরাত দেন। কিন্তু ডা. আম্বেদকর মুসলমানদেরকে নিশ্চয়তা দান করেন যে, তাদের উপর 'একই ধরনের সামাজিক আইন' জোরপূর্বক চাপিয়ে দেয়া হবে না।

তিনি বলেন, আগামীতে পার্লামেন্টে এমন ধরনের আইন প্রণয়ন করবে যার ফলে একই ধরনের সামাজিক আইন কেবল তাদের উপর আরোপিত হবে, যারা এ কথা ঘোষণা করবে যে, তারা স্বেচ্ছায় এ আইনের অধীনতা গ্রহণ করছে। ড. আম্বেদকরের এ নিশ্চয়তাদানের পর উপরোল্লিখিত সংশোধনীগুলি প্রত্যাখ্যান করা হয় এবং খসড়া শাসনতন্ত্রের এ ধারাটি গৃহীত হয়ে যায়, যা বর্তমান শাসনতন্ত্রের ৪৪ নং ধারায় সন্নিবেশিত হয়েছে।

জনাব মুহাম্মদ ইসমাঈল (মাদ্রাজ) মুসলিম পার্সোনাল ল'

সংরক্ষণের জন্য শাসনতন্ত্রের মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত ধারাসমূহে নিম্নোক্ত ধারাটি জুড়ে দিতে চাচ্ছিলেন ঃ

To Follow the Personal Law of the groups or community to which he belongs or professes to belong (Constituent Assembly Debates. Vol. VII P-721)

"(তার এ স্বাধীনতাও থাকবে যে,) সে যে গ্রুপ বা সম্প্রদায়ের সাথে সম্পর্ক রাখে যা রাখতে চায় তার পার্সোনাল ল' মেনে চলবে।"

কিন্তু শাসনতন্ত্র পরিষদ এ সংশোধনীটিও গ্রহণ করেনি। ফলে শাসনতন্ত্র প্রণয়নকালেই যে বিপদ সংকেত অনুভূত হয়েছিল বর্তমানে আমরা সরাসরি তার মুখোমুখি হয়েছি। তবে ড. আম্বেদকরের নিশ্চয়তা দান সম্পর্কে বলা যায়, সম্ভবত আজ শাসক সমাজ সে কথা ভুলে গেছেন। কাজেই তাকে গুরুত্বদানের প্রশ্নই ওঠেনা। তাই আজ আবার নতুন করে নিশ্চয়তা আদায় করার কোনো প্রয়োজন নেই। আজ প্রয়োজন হচ্ছে, শাসনতন্ত্রে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় মুসলমানদের লিখিত নিশ্চয়তা দান করতে হবে যে, তারা পূর্ণ স্বাধীনভাবে নিজেদের পার্সোনাল ল' মেনে চলতে পারবে। শাসনতন্ত্রে এই ধরনের কোনো সংশোধনী গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত একই ধরনের সামাজিক আইনের (Uniform Civil Code) তরবারি তাদের মাথার উপর ঝুলতেই থাকবে।

রাষ্ট্রের সেক্যুলার চরিত্র

মুসলিম পার্সোনাল ল' বিরোধীরা রাষ্ট্রের সেক্যুলার চরিত্রকে নিজেদের বক্তব্যের সমর্থনে যুক্তি হিসেবে পেশ করেন। তাঁদের মতে দেশের সকল নাগরিকের জন্য একই ধরনের পারিবারিক আইন হচ্ছে সেক্যুলারিজমের সুস্পষ্ট দাবী। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পৃথক পারিবারিক আইন (Family Laws) তাদের পার্থক্য (Discrimi-

nation) সৃষ্টি করার সমার্থক। আর এ পার্থক্য রাষ্ট্রের সেক্যুলার চরিত্র বিরোধী। এই চরমপন্থী সেক্যুলারবাদীরা (Ultra Secularist) নিশ্চয়ই জানেন, দুনিয়ায় ভারতই একমাত্র সেক্যুলার দেশ নয়। বরং ভারত ছাড়া আরো বহু সেক্যুলার দেশ আছে। সম্ভবত তাঁরা জানেন না যে, এমন অনেক সেক্যুলার দেশ আছে যেখানে মুসলিম পার্সোনাল ল'কে স্পর্শও পর্যন্ত করা হয়নি। দৃষ্টান্তস্বরূপ, থাইল্যান্ডের কথাই ধরুন, সেখানে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। রাষ্ট্র সেখানকার পারিবারিক আইনে পরিবর্তন সাধনও করেছে। কিন্তু সে পরিবর্তন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। মুসলমানদেরকে সে পরিবর্তন থেকে আলাদা রাখা হয়েছে। তারা নিজেদের পার্সোনাল ল' মেনে চলার ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীন। বার্মায়ও এই একই অবস্থা। গ্রীসে মুফতীদের সাহায্যে মুসলিম পার্সোনাল ল' মেনে চলার ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীন। আফ্রিকার দেশ সমূহে ইথিওপিয়া, ঘানা, গোল্ডকোষ্ট ও উগাণ্ডায়ও মুসলিম পার্সোনাল ল' প্রবর্তিত হয়েছে[২]। এসব দেশের মধ্যে অধিকাংশের শাসনতন্ত্র হচ্ছে সেক্যুলার। কোনো কোনো দেশ আবার সমাজতন্ত্রের আদর্শে পরিচালিত হচ্ছে। কিন্তু এসব দেশের সেক্যুলার চরিত্র যদি সেখানে মুসলিম পার্সোনাল ল' প্রবর্তিত থাকার পথে বাধা না হয়ে থাকে তাহলে ভারতের সেক্যুলার চরিত্র ও পথে বাধা হবে কেন?

জাতীয় সংহতি

দেশে যখনই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয় এবং রাজনীতিগণ তার উপর নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে থাকেন তখনই অধিকাংশ বক্তার বক্তব্যের সারবস্তু হয় এই যে, জাতীয় ঐক্য ও সংহতির জন্য একই ধরনের সামাজিক আইন (Uniform Civil Code) অপরিহার্য। অর্থাৎ মুসলিম পার্সোনাল ল'-এর কারণেই যেন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাগুলি

২। *Family Law reform in the Muslim world by the Tahir Md., P.- 4*

অনুষ্ঠিত হয়। এ পার্সোনাল ল'-টি বিলুপ্ত করে তদস্থলে একই ধরনের সামাজিক আইন প্রবর্তন করলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ও ধারা রুদ্ধ হয়ে যাবে। এটি যদি কোন হাতুড়ে ডাক্তারের প্রেসক্রিপশান না হয়ে থাকে তাহলে তাঁদের বলা উচিত, মুসলিম পার্সোনাল ল'-এর কারণে কোথায় এবং কবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হয়েছে? হাজার হাজার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মধ্যে কোনো একটিকেও চিহ্নিত করা যাবে কি? এতদিন পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা অনুসন্ধানের জন্যে যতগুলি কমিশন নিযুক্ত হয়েছে তন্মধ্যে কোনো একটি কমিশনও কি তাদের অনুসন্ধানলব্ধ এ সিদ্ধান্ত শুনিয়েছে যে, মুসলিম পার্সোনাল ল'-ই হচ্ছে সংশ্লিষ্ট দাঙ্গার মূল কারণ? তাহলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ক্ষেত্রে মুসলিম পার্সোনাল ল'-কে টেনে আনার কী অর্থ হতে পারে?

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কথা বাদ দিলেও দেখা যায়, বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে আবেগময় ঐক্য ও একাত্মতা সৃষ্টি করার জন্য একই ধরনের সামাজিক আইনকে অপরিহার্য গণ্য করা হয়। যেমন বিচারপতি ওয়াই. ভি. চন্দ্রচূড় একবার বোম্বাইতে এক অনুষ্ঠানে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন ঃ One Law on marriage for all would be an important step towards national integration (Indian Express, 21.1.67)

"সবার জন্য একই বিবাহ আইন জাতীয় সংহতির দিকে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বিবেচিত হবে।"

কিন্তু আসলে এর ফল হবে সম্পূর্ণ উল্টো। কারণ এর ফলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যখন অনুভব করবে, তাদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিলুপ্ত করে দেওয়া হচ্ছে তখন তাদরে মধ্যে এর প্রতিক্রিয়া ভাল হবে না। এর ফলে সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের সম্পর্কের উপর খারাপ প্রভাব পড়বে। বিপরীতপক্ষে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়, যারা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সিদ্ধান্তকারী শক্তির মর্যাদা

রাখে, তারা যদি সংখ্যালঘুদের সাথে উদার ব্যবহার করতে শুরু করে এবং বিভিন্ন গ্রুপ ও সম্প্রদায়কে সর্বাধিক ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা দান করা হয়, তাহলে তাদের মধ্যে সম্পর্ক যথেষ্ট মধুর হবে। এবং এর ফলে সাম্প্রদায়িক ঐক্য ও জাতীয় সংহতির অনুকূল পরিবেশ তৈরি হবে। অন্যথায় জাতীয় সংহতির জন্য যেভাবে একই ধরনের সামাজিক আইনকে অপরিহার্য গণ্য করা হচ্ছে অনুরূপভাবে এবং ওই একই যুক্তির মাধ্যমে একই ধরনের উপাসনা আইনকেও (Uniform Worship Code) অপরিহার্য প্রমাণ করা যেতে পারে। মসজিদ ও মন্দিরের ঝগড়াই বা আর থাকে কেন? এ সমস্ত ভেঙে ফেলে দিয়ে জাতীয় উপাসনালয় (National Temples) তৈরি করা হয় না কেন? সেখানে সকল সম্প্রদায়ের লোক একই সারিতে দাঁড়িয়ে জাতীয় বিধান (National Code) অনুযায়ী একই সঙ্গে একই ধরনের উপাসনা-ইবাদত করবে। আর সে উপাসনাও খোদার নয় বরং জাতির (Nation) হওয়া উচিত কারণ খোদার নাম আসলেই আকীদা-বিশ্বাসের প্রশ্ন উঠবে এবং এ প্রশ্নটিই সম্প্রদায়ের উদ্ভাবক। যেখানে সম্প্রদায়ের উদ্ভব হবে সেখানে সম্প্রদায় প্রীতিও দেখা দেবে। কাজেই মাথাও থাকবে না মাথা ব্যথাও হবে না— এ পদ্ধতিতে জাতীয় সংহতির জন্য ওই সবগুলি খতম করে দেওয়া অপরিহার্য। জানি না এমন একটি সহজ সত্য কথা বলতে এ রাজনীতিকগণ ইতস্ততঃ করেন কেন?

আধুনিক সভ্যতার দাবি

মুসলমানদের একটি সীমিত শ্রেণী সংখ্যায় অতি স্বল্প হলেও 'আধুনিক সভ্যতার আলোকে' চোখ খুলেছেন। কাজেই তাঁরা আধুনিক ধারা অনুযায়ী মুসলিম পার্সোনাল ল'-এর মধ্যে পরিবর্তনের পক্ষপাতী। শরীয়তের আইনের মধ্যে যে যথার্থই জুলুম ও বর্বরতা

রয়েছে এবং এরই ফলে মুসলিম সমাজে গলদ দেখা দিয়েছে, তাই মূলতঃ এর মধ্যে সংশোধনের প্রয়োজন, এটি তার আসল কারণ নয়। মূলতঃ শরীয়তের আইনের মধ্যে কোনো প্রকার জুলুম ও বর্বরতার অবকাশই নেই। কারণ শরীয়তের আইন আল্লাহ্ অবতীর্ণ করেছেন। আর আল্লাহর বান্দাহ অর্থাৎ মানুষের অবস্থা-সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত। কাজেই আধুনিক সভ্যতার ধ্বজাধারীদের এই পক্ষপাতের মূল কারণ হচ্ছে, আধুনিক সভ্যতার বাহ্যিক চাকচিক্য তাঁদের দৃষ্টিশক্তিকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। ফলে পাশ্চাত্য সভ্যতা থেকে তাঁরা সাম্য ও ন্যায়ের যে ধারণা লাভ করেছেন তার তুলনায় ইসলামের সামাজিক নীতিকে অপরিপক্ক মনে করতে শুরু করেছেন। তাঁদের দৃষ্টিতে ইসলামের সমাজ ব্যবস্থা বর্তমানে প্রাচীন ও জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে। কারণ এ সমাজব্যবস্থা আধুনিক ভাবধারার সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়। কাজেই তাঁরা এই বন্ধ মুক্ত হয়ে আধুনিক ভাবধারায় সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চান। সে সমাজে নারী ও পুরুষ সমান মর্যাদার অধিকারী হবে।

এই শ্রেণীর লোকেরা যদি উন্মুক্ত মনে ইসলামের সমাজ ব্যবস্থা আধ্যয়ন করতেন এবং মানুষের প্রকৃতি ও তার নৈতিক অবস্থাকে উপক্ষো না করতেন, তাহলে তাঁরা ইসলামের সমাজ ব্যবস্থায় পরিপূর্ণ সৌন্দর্য ও ভারসাম্য দেখতে পেতেন। নিঃসন্দেহে ইসলাম পুরুষকে নারীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছে। এ শ্রেষ্ঠত্ব হচ্ছে নেতৃত্বের। নেতৃত্বের এ শ্রেষ্ঠত্ব পুরুষের প্রাকৃতিক গঠন ও স্বাভাবিক ক্ষমতার সাথে সামঞ্জস্যশীল। এ ছাড়া পারিবারিক জীবনে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক নৈতিক মূল্যমানগুলিও অপরিবর্তিত রাখা সম্ভবপর নয়। এ কারণেই ইসলাম তালাক প্রদানের ক্ষমতা নারীর পরিবর্তে পুরুষের হাতে সোপর্দ করেছে। তবে নারীকে 'খুলা'র অধিকারও দিয়েছে। অনুরূপভাবে

বাপের সম্পত্তিতে মেয়ের অংশ ছেলের অর্ধেক রয়েছে। কারণ অর্থোপার্জনের দায়িত্ব পুরুষের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। পুরুষই নিজের স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করবে। উপরন্তু স্ত্রী নিজের স্বামীর নিকট থেকে মোহ্‌রানাও লাভ করে। তাই ন্যায়তঃ ছেলে ও মেয়ের অংশের মধ্যে পার্থক্য হওয়া উচিত। কিন্তু আধুনিক সভ্যতা ন্যায়ের নামে অন্যায়ের লাঠি চালাতে চায়। কাজেই তার দৃষ্টিতে ইসলামের এ ব্যবস্থা কেমন করে ন্যায়সংগত প্রতীয়মান হতে পারে? তার নিকট সাম্যই সব কিছু। অথচ মানুষের প্রকৃতি সাম্যের এই চরমপন্থী ধারণার সাথে অপরিচিত। মানুষ হিসেবে বাপ ও ছেলে অবশ্যই সমান। এ সত্ত্বেও বাপ ছেলে উপর শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা সম্পন্ন। ছেলে বাপকে অবশ্যই সম্মান করবে। এ জন্যই বাপের আদেশ মেনে চলা ছেলের জন্য অপরিহার্য। কিন্তু যদি সাম্যের চরমপন্থী দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করা হয় তাহলে বলতে হয়, বাপ ও ছেলে দু'জন সমান, দু'জনের মধ্যে মর্যাদার কোনো পার্থক্য নেই এবং ছেলের জন্য বাপের আদেশ মেনে চলারও কোনো প্রয়োজন নেই। আর ছেলের জন্য বাপের আদেশ মেনে চলা যদি অপরিহার্য হয়ে থাকে, তাহলে ন্যায় ও সাম্যের দাবী অনুযায়ী বাপের জন্যও ছেলের আদেশ মেনে চলা অপরিহার্য হবেনা কেন?

মুসলিম দেশে পার্সোনাল ল'য়ে পরিবর্তন

আধুনিক মতাদর্শ ও ভাবধারা অনুযায়ী যারা মুসলিম পার্সোনাল ল'য়ে পরিবর্তন সাধন করতে চান তাঁরা প্রায়ই স্বপক্ষে মুসলিম দেশসমূহের দৃষ্টান্ত পেশ করে থাকেন। তাঁদের মতে মুসলিম দেশসমূহে যখন মুসলিম পার্সোনাল ল'র মধ্যে পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে তখন ভারতের মুসলমানরা দুনিয়ার অন্যান্য দেশের মুসলমানদের থেকে আলাদা থাকবে কেন? তারা কোন প্রকার পরিবর্তনের নাম নেওয়া পছন্দ করে না কেন? এই প্রশ্নকারীগণ আসলে পরিস্থিতির

যথার্থ চিত্র পেশ করছেন না। তাঁরা বাড়িয়ে চাড়িয়ে বর্ণনা করে ভুল ধারণা দেবার চেষ্টা করছেন।

আসলে অধিকাংশ মুসলিম দেশে মুসলিম পার্সোনাল ল'-এর মধ্যে কোনো প্রকার পরিবর্তন করা হয়নি। বরং সেখানে শরীয়তের আইন প্রচলিত ও প্রবর্তিত আছে। সউদী আরব, ইয়েমেন, বাহরাইন, কুয়েত, কাতার, দুবাই, আবুধাবী, আফগানিস্তান, মালদ্বীপ, গিনি, সেনেগাল, সোমালিয়া ও নাইজিরিয়া এর প্রমাণ। এসব দেশগুলির কোথাও হাম্বলী ফিকাহর প্রচলন আছে, কোথাও মালেকী ফিকাহ—আবার কোথাও হানাফী ফিকাহ এবং কোথাও শাফেয়ী ফিকাহ আইনের মর্যাদা লাভ করেছে। সউদী আরবে হাম্বলী ফিকাহ আইনের মর্যাদা লাভ করেছে বরং সেখানে শাসনতান্ত্রিক বিধান অনুযায়ী সব রকমের আইন প্রণয়ন কোরআন-সুন্নাহ ও সাহাবাগণের আদর্শ অনুযায়ী হতে হবে। ইয়েমেনে যায়েদী ফিকাহর প্রচলন আছে। দক্ষিণ ইয়েমেনে শাফেয়ী বা হানাফী আইনের অনুসরণ করা হয়।

বাহরাইনে মালেকী, শাফেয়ী ও শিয়া ফিকাহর প্রবর্তন আছে। কুয়েতে ইসলামের পারিবারিক আইন প্রবর্তিত আছে এবং সাধারণভাবে মালেকী ফিকাহর প্রচলন রয়েছে[৩]। আফগানিস্তানের শাসনতন্ত্র অনুযায়ী সেখানকার সরকারী ধর্ম হচ্ছে ইসলাম এবং সকল প্রকার ধর্মীয় বিষয়াদি হানাফী ফিকাহ অনুযায়ী সম্পন্ন করা হয়। সেখানে প্রচলিত ইসলামী আইনে কোনো প্রকার পরিবর্তন সাধন করা হয়নি। মালদ্বীপে শাফেয়ী মতের পারিবারিক আইন প্রচলিত আছে। আফ্রিকার চাদ, গাম্বীয়া, গিনি, মালি, মারিতানিয়া, নাইজিরিয়া, সেনেগাল ও সোমালিয়ায় প্রচলিত ইসলামের পারিবারিক আইনের মধ্যে কোন প্রকার পরিবর্তন করা হয়নি। নাইজিরিয়ায় মালেকী ফিকাহ পারিবারিক ও মীরাসী আইনের মর্যাদা লাভ করেছে।

৩। *Family Law reform in the Muslim world by the Tahir Md., P.- 3*

যেসব মুসলিম দেশে পরিবার আইনের মধ্যে সংশোধন করা হয়েছে সেখানে অধিকাংশ সংশোধন এমন পর্যায়ের যে, তাতে বিভিন্ন ফকীহী মতের মধ্যে থেকে কোনো একটি মতকে আইনের মর্যাদা দান করা হয়েছে অথবা কোনো বিস্তারিত বিষয়কে আইন ও বিধানের রূপ দান করা হয়েছে। তন্মধ্যে অনেক আইন ও বিধান নিছক শৃঙ্খলারক্ষার খাতিরেই প্রবর্তন করা হয়েছে। মাত্র দুটি মুসলিম দেশে ইসলামের পারিবারিক আইন বিলুপ্ত করে সেকুলার ধরনের সামাজিক আইন প্রবর্তনের সাহস করা হয়েছে। এ দেশ দুটি হচ্ছে তুরস্ক ও আলবানিয়া। তুরস্কে ১৯২৬ সালে এ পরিবর্তন সাধন করা হয়। ইসলামের পারিবারিক ও মীরাস আইন বাতিল করে দিয়ে তদস্থলে সুইজারল্যাণ্ডের সামাজিক আইন প্রবর্তন করা হয়। কিন্তু তুরস্ক সম্পর্কে সবাই জানেন সেখানে মোস্তফা কামাল পাশার আমলে ইসলামের সমগ্র চেহারাই বিকৃত করে দেয়া হয়েছিল। বলপূর্বক ও ডিক্টেটরী পদ্ধতিতে ধর্মহীনতার ভিত্তিতে রাষ্ট্রকে পূনর্গঠিত করা হয়েছিল। এমন কি আরবী ভাষায় আযান দেয়াও বেআইনী ঘোষিত হয়েছিল। কাজেই এমন একটি দেশের দৃষ্টান্তকে মুসলিম পার্সোনাল ল' পরিবর্তন করার স্বপক্ষে যুক্তি হিসেবে দাঁড় করানো যাবেনা। উপরন্তু এ সত্যটি কোনক্রমেই উপেক্ষা করা যেতে পারেনা যে, কোন মুসলিম দেশ যদি শরীয়তের উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্যের বিরুদ্ধে মুসলিম পার্সোনাল ল'-এর মধ্যে কোনো প্রকার পরিবর্তন করে অথবা তা বাতিল করে দিয়ে অনৈসলামী আইন প্রবর্তন করে, তাহলে শরীয়তের বিধান অনুযায়ী তার এ ধরনের কোনো অনুসরণযোগ্য দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠিত হয়না। আর যেখানে তুরস্কের দৃষ্টান্ত দেয়া হয় সেখানে যে সকল দেশে ইসলামের পারিবারিক ও মীরাস আইনের মধ্যে কোনো প্রকার পরিবর্তন করা হয়নি তাদের দৃষ্টান্ত দেয়া হয়না কেন? উপরে এ ধরনের দেশের কথা আলোচনা করা হয়েছে এবং তাদের সংখ্যা এক নয়, দুই নয়, বহু।

ইসরাঈল সরকার পর্যন্ত এখনো ইসলামের পরিবার ও মীরাস আইন পরিবর্তন করার সাহস করেনি। তুরস্কের ১৯৯৭ সালের পরিবার আইন (Ottoman Law of Family Rights 1917) শরীয়তের আলোকে রচিত হয়েছিল এবং পরে ১৯২৬ সালের তুরস্ক সরকার তা বিলুপ্ত করে দিয়েছিল কিন্তু তা ইসরাঈলে সেখানকার মুসলমানদের জন্য প্রবর্তিত আছে। তবে ইসরাঈল সরকার এ আইনকে দেশের সাধারণ আইনের অধীন রেখেছে।

পরিবর্তন পন্থীরা এ ব্যাপারে জোরে-শোরে পাকিস্তানের দৃষ্টান্ত পেশ করে থাকে। অথচ পাকিস্তানে আজো সেকুলার সামাজিক আইন নয় বরং মুসলিম পার্সোনাল ল'-ই প্রবর্তিত আছে। তবে ১৯৬১ সালে পরিবার আইনের মাধ্যমে কতিপয় সংশোধন করা হয়। এ সংশোধনগুলির অধিকাংশই প্রশাসনিক অথবা কোনো কোনো সংশোধনীকে নিয়ম-বিধির রূপদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে একটি বড় 'সংশোধনী' হচ্ছে এই যে, প্রত্যেক বিয়েকে রেজিষ্ট্রীকৃত করা অপরিহার্য গণ্য করা হয়েছে। কিন্তু যদি কেউ বিয়ে রেজিষ্ট্রী না করে তাহলে তা আইনত অবৈধ গণ্য হবেনা। বরং এজন্য কিছু শাস্তি নির্ধারিত করা হয়েছে। দ্বিতীয় একটি বড় 'সংশোধনী' এই যে, এক স্ত্রীর বর্তমানে দ্বিতীয় বিয়ের জন্য এ্যার্বিটেশন কাউন্সিলের নিকট (Arbiitration Council) থেকে অনুমতি পত্র লাভ করতে হবে। যদি তা না করা হয়, তাহলে সেজন্য কিছু শাস্তি নির্ধারিত করা হয়েছে, দ্বিতীয় বিয়েকে বাতিল গণ্য করা হয়নি। এ থেকে প্রমাণ হয়, একাধিক বিয়ের উপর পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়নি। তৃতীয় 'সংশোধন' হচ্ছে ঃ তালাকের ব্যাপারে পুরুষের জন্য অপরিহার্য গণ্য করা হয়েছে যে, এজন্য তাকে এ্যার্বিট্রেশন কাউন্সিলকে জানাতে হবে। এই কাউন্সিল স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সমঝোতা করার চেষ্টা করবে। এ থেকে বুঝা যায়, এ আইনটি পুরুষের হাত থেকে তালাকের ইখতিয়ার ছিনিয়ে নেয়নি। বরং একটি বিধির মাধ্যমে

সমঝোতার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে। চতুর্থ 'সংশোধন' মীরাস সম্পর্কিত। অর্থাৎ এতিম নাতি ও এতিম নাতনীকে মীরাস থেকে সেই পরিমাণ অংশ দেওয়া হয়েছে যে পরিমাণ অংশ তাদের বাপ বেঁচে থাকলে দাদার সম্পত্তি থেকে পেতো। এই 'সংশোধনী'গুলি সম্পর্কে শরীয়তের দৃষ্টিতে আলোচনা করা যেতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তানে কোনোদিন মুসলিম পার্সোনাল ল' বাতিল করা হয়নি এবং তদস্থলে অনৈসলামী সামাজিক আইন প্রবর্তিত হয়নি। এমন কি মুসলিম পার্সোনাল ল'-র মধ্যে সেখানে কোনো বড় রকমের পরিবর্তন করা হয়নি।

উপরন্তু এ বিষয়টি মোটেই উপেক্ষণীয় নয় যে, পাকিস্তানের আলেম সমাজ এ পরিবর্তনগুলির ভীষণ বিরোধিতা করেছিলেন। জনসাধারণও জানিয়েছিল কঠোর প্রতিবাদ। কিন্তু সেখানকার ডিক্টেটর সরকার জনমতের কোনো মূল্যই দেয়নি। ডিক্টেটর সরকারের এ দৃষ্টান্ত আমাদের এ গণতান্ত্রিক দেশের জন্য আদর্শ হতে পারে কেমন করে?

এছাড়া এ প্রসঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে যে, মুসলমানরা পাকিস্তানে সংখ্যাগুরু আর পাকিস্তান সরকার এই সংখ্যাগুরু মুসলমানদের পার্সোনাল ল'-এর মধ্যে সংশোধন করেছেন। পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের পার্সোনাল ল'-এর উপর কোনোপ্রকার হস্তক্ষেপ করা হয়েছে কি? যদি তা না হয়ে থাকে, তাহলে পাকিস্তানে মুসলিম পার্সোনাল ল'-র সংশোধন ভারতের সংখ্যালঘু মুসলমানদের পার্সোনাল ল'-এর পরিবর্তনের পথ প্রশস্ত করবে কেমন ক'রে?

একই ধরনের সামাজিক আইনের রূপ

সরকার যদি একই ধরনের সামাজিক আইন প্রণয়নে সফলকাম হন, তাহলে তা কেবল একাধিক বিয়ের উপর নিষেধাজ্ঞা পর্যন্ত

সীমাবদ্ধ থাকবে না বরং বিয়ে, খুলা, বিবাহ, বিচ্ছেদ ও মীরাস এবং এই ধরনের আরো বিভিন্ন আইন এর গন্ডীর মধ্যে এসে যাবে। আর এ ব্যাপারে যেকোনো আইন প্রণয়ন করা হবে দেশের সকল নাগরিক তার আওতায় এসে যাবে। এ ব্যাপারে মুসলমান-হিন্দু-খ্রীস্টান-পার্সীর কোনো পার্থক্য থাকবে না। এ আইন প্রণয়ন হবে সকল প্রকার ধর্মীয় বন্ধন থেকে মুক্ত। কাজেই কেবল ফকীহগণের ইজতিহাদ ও উম্মতের 'ইজমা'র সাথে এর বিরোধ হবে না বরং কোরআন ও সুন্নাহর সুস্পষ্ট বিধানসমূহ হবে এর লক্ষ্যস্থল।

খোদা না করুন যদি কখনো একই ধরনের সামাজিক আইন প্রণয়ন করতে হয়, তাহলে তাতে কোন ধরনের বিধি-ব্যবস্থা থাকবে তা একমাত্র তখনই জানা যাবে। কিন্তু এ আইন কোন ধরনের হবে তা অজানা ও অনির্ধারিত নয়। কারণ সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে এ আইন গৃহীত হবে। পার্লামেন্টে আইন প্রণয়নের জন্য এ রীতিই নির্ধারিত আছে। এভাবে কার্যত সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ই এ আইন রচনা করবে। বলাবাহুল্য এদেশের সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় পাশ্চাত্য সভ্যতা নির্ধারিত পথে চিন্তা করে। যেমন একাধিক বিয়ের উপরে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হওয়া উচিত, তালাক দানের অধিকার পুরুষের নয় আদালতের থাকবে, মীরাসের ব্যাপারে ছেলে ও মেয়ের অংশ সমান হওয়া উচিত প্রভৃতি। সবাই জানেন, কয়েক বছর আগে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় হিন্দু কোড বিল পাশ করেছিলেন। বর্তমান তা হিন্দু বিবাহ আইন (Hindu Marriage Act) ও হিন্দু সাকসেশান অ্যাক্ট (Hindu Succession Act) নাম প্রবর্তিত আছে। এ আইনের মাধ্যমে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের মানসিকতা সুস্পষ্ট হয়ে ধরা দিয়েছে। তাই একথা মোটেই অতিরঞ্জিত নয় যে, হিন্দু কোডবিলের আয়নায় একই ধরনের সামাজিক আইনের প্রতিবিম্ব দেখা যেতে পারে। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ওরিয়েন্টার ল'-এর অধ্যাপক জে. ডানকান সম্প্রতি ইন্ডিয়ান সিভিল কোড সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তা থেকেও এর

সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন—

"The Civil Code promised in Article 44 of the Constitution is like the 'Hindu Code' of which we have spoken before, a misnomer. Bur a convenient one (Religion Law and State in India by J. duncun P.546)"

"শাসনতন্ত্রের ৪৪নং ধারায় যে সামাজিক আইনের ওয়াদা করা হয়েছে তা হিন্দু কোডের ন্যায়, যে সম্পর্কে আমি ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। যদিও (হিন্দু কোড) নামের দিক দিয়ে বিভ্রান্তিকর কিন্তু এই একই বিষয় (সামাজিক আইনের আলোচ্য)।"

সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের মানসিকতা ও চিন্তাধারা যেখানে সুস্পষ্ট সেখানে কেমন করে আশা করা যেতে পারে যে, একই ধরনের সামাজিক আইন প্রণয়নের সময় তারা তা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের সিদ্ধান্ত করবে? খুঁটি-নাটি বিষয়েও বিস্তারিত উপধারা সমূহে হয়তো কিছুটা পার্থক্য হতে পারে কিন্তু নীতিগত সিদ্ধান্ত হিন্দু কোডের রূপে যা কিছু বর্তমান আছে তাই হবে। অন্যকথায় হিন্দু কোডকে সামান্য হেরফের করে একই ধরনের সামাজিক আইনে রূপান্তরিত করা হবে। কাজেই বর্তমান হিন্দু সামাজিক আইন পর্যালোচনা করে দেখতে হবে যে পার্সোনাল ল' থেকে তা কি পরিমাণ ভিন্ন এবং এর সাথে তার সংঘর্ষ কোথায়?

১৯৫৫ সালের হিন্দু বিবাহ আইন (Hindu Marriage Act.) যার সাধারণ নাম হিন্দু কোড—অনুযায়ী এক স্ত্রীর বর্তমানে দ্বিতীয় বিয়ে করা যেতে পারেনা[৪]। অথচ ইসলাম ন্যায় ও ইনসাফের শর্ত সাপেক্ষে

৪। *Any marraige between two Hindus Solemnised after commencement of this act is void, If at the date of such marriage either party had a husband or wife living. and the provisions of section 494 and 495 of the Indian penal Code shall apply accordingly. (Section 17) প্রকাশ থাকে যে, দ্বিতীয় বিয়ে করলে ইন্ডিয়ান পেনাল কোডে সাত বছরের কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করা হয়েছে।*

চারটি পর্যন্ত বিয়ে করার অনুমতি দান করেছে। বিভিন্ন কারণে ও উদ্দেশ্যে এ অনুমতি দান করা হয়েছে। কোন্ অবস্থায় দ্বিতীয় বিয়ে করার প্রয়োজন দেখা দেয়? যদি কারোর স্ত্রী চিররোগী হয় অথবা তার সন্তানাদি হয় না তাহলে এ অবস্থায় পুরুষের সামনে দুটি পথ থাকে। এক, সে ঐ স্ত্রীকে তালাক দিতে পারে এবং অন্য একটি মেয়েকে বিয়ে করতে পারে। দুই, ঐ স্ত্রীকে বহাল রেখে দ্বিতীয় বিয়ে করতে পারে। বলাবাহুল্য প্রথম অবস্থাটির তুলনায় দ্বিতীয় অবস্থাটি অনেক ভালো। কিন্তু একাধিক বিয়ের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হলে লোকেরা প্রথম অবস্থাটি গ্রহণ করেত বাধ্য হবে। অথচ এ অবস্থাটি নারীর জন্যে মোটেই কল্যাণপ্রদ হবেনা।

বিধবা সমস্যা সমাধানের সাথেও একাধিক বিয়ের সম্পর্ক রাখা একান্ত অপরিহার্য। এক্ষেত্রে সব চাইতে বড় কথা হচ্ছে এই যে, ইসলাম পুরোপুরি একটি খোদাভীতি ও পাক-পবিত্রতামূলক দ্বীন, তাই এই দ্বীন পুরুষকে অবৈধ পথসমূহ থেকে রক্ষা করার জন্য একাধিক বিয়ের পথ উন্মুক্ত রেখেছে। এই বৈধ পথটি রুদ্ধ করে দিলে অবৈধ পথগুলি উন্মুক্ত হয়ে যাবে। পাশ্চাত্য সভ্যতা মূলতঃ এই পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। আইন করে একাধিক বিয়ে অবৈধ করেছে কিন্তু বেআইনীভাবে যত ইচ্ছা তত মেয়ের সাথে 'সম্পর্ক' স্থাপন কিভাবে করা যায় তার অবকাশ রেখেছে। বরং পাশ্চাত্য সভ্যতা নৃত্য, গীত প্রভৃতির মাধ্যমে যৌন ও নৈতিক ভ্রষ্টতার যাবতীয় উপাদান সরবরাহ করে এবং মানসিক উত্তেজনা সৃষ্টি করে, যার ফলে কোনো পুরুষ একজন মেয়ের উপর সন্তুষ্ট থাকতে পারেনা। কিন্তু অন্যদিকে আইন করে এক বিয়েকে প্রবর্তিত করতে চায়। পাশ্চাত্য সভ্যতার ধ্বজাধারীরা কোথায় থেকে একাধিক বিয়ের বৈধ পথ রুদ্ধ করার অধিকার লাভ করলো?

তালাকের ব্যাপারেও হিন্দু কোড ইসলামের তালাক আইনের সম্পূর্ণ পরিপন্থী এবং আধুনিক তথা পাশ্চাত্য সভ্যতার সাথে

সামঞ্জস্যশীল। হিন্দু কোডে তালাকের অধিকার পুরুষকে নয়, আদালতকে দান করা হয়েছে। যদি কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক দিতে চায় বা স্ত্রী স্বামীর নিকট থেকে তালাক নিতে চায় তাহলে স্বামী বা স্ত্রীকে আদালতে আবেদন করতে হবে। আদালত যদি কোডে উল্লিখিত কারণগুলির মধ্য থেকে কোনো একটি কারণের ভিত্তিতে তালাকের ডিক্রী ৃঙ্গত্রত্বন্ত্রত্রূ দেয় তাহলে তাদের উভয়ের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে। কিন্তু বিয়ের তিন বছরের মধ্যে যে তালাকের আবেদন পেশ করা হয়েছে কোনো আদালত তা গ্রহণ করবে না।

ইসলাম পুরুষকে তালাকের ইখতিয়ার ও স্ত্রীকে খুলার অধিকার দান করেছে। হিন্দু কোড এ উভয়টিকেই নাকচ করে দিয়েছে। অর্থাৎ পুরুষের তালাক দেবার ইখতিয়ার নেই এবং স্ত্রীর খুলা গ্রহণের অধিকারও নেই। বরং—উভয়েই তাদের ব্যাপারটি আদালতে পেশ করতে বাধ্য। এর মধ্যে যে ক্ষতি ও ক্রটি আছে তা সুস্পষ্ট। স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপারটি হামেশা আদালতে পেশ করা সংগত হয়না। আবার আরোপিত অভিযোগগুলি আইনতঃ প্রমাণ করে দেখানোও সহজ হয়না। কাজেই এই ধরনের আইনগত জটিলতা সৃষ্টি করার ফলে স্বামী তালাকের ফেরে পড়ার পরিবর্তে স্ত্রীকে ঝুলিয়ে রাখবে এবং তার জীবন বরবাদ করে দেবে অথবা তার বিরুদ্ধে মিথ্যা ও বিশ্রী ধরনের অভিযোগ এনে আদালতে পেশ করবে এবং নিজের স্বপক্ষে আদালতের রায় নেবার চেষ্টা করবে। অনুরূপভাবে স্ত্রীও স্বামীর হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য খুলা তালাকের সহজ পথ অবলম্বন করতে পারবেনা। বরং তাকে আদালতের দুয়ারে ধর্ণা দিতে হবে। আর আদালত যদি তার স্বপক্ষে সিদ্ধান্ত না দেয়, তাহলে যে স্বামীর বিরুদ্ধে কেস নিয়ে সে আদালতে পৌঁছে গিয়েছিল তার সাথে বনিবনা হবে কেমন করে? সূদুর প্রসারী ফলাফলের প্রতি দৃষ্টি রাখলে একথা জোর করে বলা যেতে পারে যে, তালাকের ইখতিয়ার পুরুষের হাত থেকে

ছিনিয়ে নিয়ে আদালতের হাতে সোপর্দ করলে স্ত্রীর জন্য তা কল্যাণকর হতে পারেনা বরং তার জন্য ক্ষতিকরই হবে।

আর একটি প্রশ্ন হচ্ছে, যদি তালাকের ইখতিয়ার পুরুষের হাত থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয় এবং এর পরও কোনো মুসলমান শরীয়ত নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিজের স্ত্রীকে বায়েন তালাক দেয়, তাহলে এ অবস্থায় কার্যতঃ কি করা যাবে? আইন এই তালাককে স্বীকার করবে না অর্থাৎ তালাক দেবার পরও তাকে আইনগত নিজের স্ত্রী বানিয়ে রাখতে হবে। অথচ শরীয়ত অনুযায়ী সে তার স্ত্রী নয়। অনুরূপভাবে স্বামী যদি দেখে যে, তার স্ত্রী অন্য পুরুষের সাথে প্রেম করছে কিন্তু আদালতে সে এর কোনো প্রমাণ পেশ করতে পারবে না এবং তালাকের ইখতিয়ারও তার হাত থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে, তাহলে সে তাকে নিজের স্ত্রী বানিয়ে রাখতে বাধ্য হবে। এ অবস্থা একজন মুসলমানের জন্য—যার দৃষ্টিতে চরিত্র, নৈতিকতা ও পাক পবিত্রতাই হচ্ছে জীবনের মূলধন—ভীষণ ও মারাত্মক দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

ভরণ-পোষণের ব্যাপারে হিন্দু কোডে বলা হয়েছে, আদালতের মাধ্যমে যখন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে তখন পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ের আর্থিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আদালত পুরুষ বা স্ত্রীর উপর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব ততদিনের জন্য চাপিয়ে দিতে পারে যতদিন আত্ম বেদনকারী দ্বিতীয় বিয়ে করবে না বা উভয়ের মধ্য থেকে একজন মারা যাবে না। অর্থাৎ ন্যায় ও সাম্যের দাবী হচ্ছে, ভরণ-পোষণের দায়িত্ব যেমন পুরুষের তেমনি তা নারীর উপরও অর্পিত হতে হবে এবং যদিও উভয়ের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক শেষ হয়ে গেছে তবুও ভরণ-পোষণের দায়িত্ব বহাল থাকতে পারে। তালাককে যতদূর সম্ভব কঠিন করে দেয়া ছাড়া এর আর কি অর্থ হতে পারে? কিন্তু এর ফল কি দাঁড়াবে তা একবার চিন্তা করা হয় না? স্বামী যখন স্ত্রীকে রাখতে চায়না কিন্তু তাকে ছেড়ে দেবার ব্যাপারে মারাত্মক রকমের অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়, তখন

সে ঐ স্ত্রীর জীবনকে বিষময় করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় উপাদানের ব্যবস্থা করতে পারে।

উত্তরাধিকারে ব্যাপারে হিন্দু সাকসেশান এ্যাক্ট ১৯৫৬ (Hindu Succession Act 1956) প্রবর্তিত আছে। এটিকেও সাধারণভাবে হিন্দু কোড বলা হয়। এর ভিত্তিও আধুনিক মতবাদ তথা পাশ্চাত্য সভ্যতার উপর প্রতিষ্ঠিত, হিন্দু শাস্ত্রের উপর নয়। এই কোডে মীরাস বন্টনের জন্য যেসব বিধান প্রণীত হয়েছে সেগুলির সারমর্ম নিম্নরূপ ঃ

১) মীরাস সর্বপ্রথম প্রথম শ্রেণীর উত্তরাধিকারীদের মধ্য বন্টন করা হবে। প্রথম শ্রেণীর উত্তরাধিকারীদের মধ্যে পুত্র, কন্যা, বিধবা, মা, নাতি, নাতনী, জীবদ্দশায় যাদের পিতার মৃত্যু হয়েছে— অন্তর্ভূক্ত তাদের প্রত্যেকেই সমান সমান অংশ পাবে। তবে নাতি ও নাতনীরা সমষ্টিগতভাবে একটি মাত্র অংশ পাবে।

২) যদি প্রথম শ্রেণীর উত্তরাধিকারীরা বর্তমান না থাকে, তাহলে দ্বিতীয় শ্রেণীর উত্তরাধিকারীদের মধ্যে মীরাস বন্টিত হবে। এর মধ্যে প্রথম শ্রেণীকে দ্বিতীয় শ্রেণীর উপর এবং দ্বিতীয় শ্রেণীকে তৃতীয় শ্রেণীর উপর অগ্রাধিকার দেয়া হবে। প্রথম শ্রেণীতে একমাত্র পিতা উত্তরাধিকারী, দ্বিতীয় শ্রেণীতে নাতনীর ছেলে ও মেয়ে এবং ভাই ও বোন, তৃতীয় শ্রেণীতে দৌহিত্রের ছেলে ও মেয়ে এবং দৌহিত্রীর ছেলে ও মেয়ে অন্তর্ভূক্ত, চতুর্থ শ্রেণীতে ভাইপো, ভাগিনেয়, ভাইঝি ও ভাগনী অন্তর্ভূক্ত, পঞ্চম শ্রেণীতে দাদা ও দাদী, ষষ্ঠ শ্রেণীতে পিতার বিধবা ও ভায়ের বিধবা এবং পঞ্চম শ্রেণীতে চাচা ও ফুফী অন্তর্ভূক্ত।

৩) মৃত যদি স্ত্রীলোক হয়, তাহলে তার সম্পত্তি প্রথমত ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে (দাদীর জীবদ্দশায় যেসব নাতি নাতনীর মৃত্যু হয়েছে তারা সহ এবং তাদের অংশ সামগ্রিকভাবে তাদের মৃত পিতার অংশের সমান হবে) এবং স্বামীর মধ্যে বন্টিত হবে, দ্বিতীয় শ্রেণীতে স্বামীর উত্ত রাধিকারীদের মধ্যে তৃতীয় শ্রেণীতে মা ও বাপের মধ্যে, চতুর্থ শ্রেণীতে

পিতার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে এবং সর্বশেষ মায়ের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বন্টিত হবে।

এই উত্তরাধিকার আইন—যাকে সম্ভবত সামান্য হেরফের করে একই ধরনের সামাজিক আইনের (Uniform Civil Code) রূপ দান করা হবে—মূলগতভাবে ইসলামের মীরাস আইন থেকে ভিন্ন। ইসলাম মেয়ের অংশে ছেলের অর্ধেক রেখেছে। এর কারণ আগেই বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু আধুনিক সভ্যতা সুস্পষ্ট সত্যকে উপেক্ষা করে সাম্যের অন্ধ নীতি কায়েম করেছে। যার ফলে পুরুষ ও নারী উভয়কে একই সমতলে রাখা হচ্ছে। আর এই সভ্যতার প্রভাবাধীনে হিন্দু কোডে ছেলে ও মেয়ে অংশ সমান সমান নির্ধারিত হয়েছে। নয়তো হিন্দুদের মধ্যে মেয়েকে অংশ দেবার কোনো প্রথাই ছিলনা। অর্থাৎ এক জামানায় ছিল এক প্রান্তিকতা আর এখন অন্য আর এক প্রান্তিকতা। কিন্তু ইসলাম এই দুই প্রান্তিকতার মধ্যে মধ্যম পথ অর্থাৎ ন্যায় ইনসাফ, বাস্তবতা ও সত্যের পথ অবলম্বন করেছে।

ইসলাম স্ত্রীর অংশ সন্তানাদি না থাকা অবস্থায় এক-চতুর্থাংশ এবং সন্তানাদি থাকা অবস্থায় এক-অষ্টমাংশ নির্ধারিত করেছে। মায়ের অংশ সন্তান থাকা অবস্থায় এক-ষষ্ঠাংশ এবং না থাকা অবস্থায়, এক-তৃতীয়াংশ নির্ধারিত করেছে। কিন্তু হিন্দু কোডে মা, বিধবা, ছেলে ও মেয়ে সবার অংশ সমান রাখা হয়েছে।

ইসলাম বাপের অংশ সন্তানাদি থাকা অবস্থায় এক-ষষ্ঠাংশ এবং সন্তানাদি না থাকা অবস্থায় স্ত্রী ও মাকে দেবার পর অবশিষ্ট সম্পত্তির উত্তরাধিকারী বাপকে গণ্য করেছে। আর যদি তাদের মধ্য থেকে কেউ জীবিত না থাকে, তাহলে বাপ সম্পূর্ণ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে। কিন্তু হিন্দু কোডে বাপকে দ্বিতীয় শ্রেণীর উত্তরাধিকারী গণ্য করা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে, প্রথম শ্রেণীর উত্তরাধিকারী যেমন ছেলে, মেয়ে, স্ত্রী ও মায়ের বর্তমানে বাপ কিছুই পাবেনা। আধুনিক সভ্যতার ন্যায়নীতির ধারণা

হচ্ছে এই যে, মায়ের অংশ অবশ্যই পাওয়া উচিত কিন্তু বাপকে দেবার প্রয়োজন কি?

ইসলাম নিকটবর্তী আত্মীয়ের উপস্থিতিতে দূরবর্তী আত্মীয়ের অংশ নির্ধারিত করেনি। তবে তাদের জন্য ১/৩ এক তৃতীয়াংশ পরিমাণ অসিয়ত করার অবকাশ রেখেছে এবং এতিম নাতির সমস্যার সমাধান এরই মধ্যে নিহিত রয়েছে। কিন্তু হিন্দু কোডে এর থেকে আলাদা পথ অবলম্বন করা হয়েছে এবং নিকটবর্তী আত্মীয়দের বর্তমান অন্যান্য আত্মীয়দেরকেও অংশ দেওয়া হয়েছে।

বর্তমান হিন্দু কোডে যদিও ইসলামের উত্তরাধিকার আইন থেকে ফায়দা হাসিল করা হয়েছে, যেমন মেয়েদের অংশ দান প্রভৃতি, কিন্তু এই কোডটি ইসলামের মীরাস আইন থেকে মূলগতভাবে পৃথক। কাজেই এ কোডটি যদি একই ধরনের সামাজিক আইনের (Uniform Civil Code) মর্যাদা লাভে করে, তাহলে তার ফলে মুসলমানদের জন্য নানান সমস্যা দেখা দেবে। কোন আত্মীয় শরীয়ত নির্ধারিত অংশ থেকে কম পাবে। কেউ তা থেকে বেশী পাবে আবার কেউ একেবারে বঞ্চিত হয়ে যাবে। এ হবে সুস্পষ্ট জুলুম ও অন্যায়। যে ব্যক্তি শরীয়ত নির্ধারিত অংশ থেকে বেশী পাবে, তা তার জন্য বৈধ হবেনা। কারণ অন্যের অধিকার গ্রাসের ভিত্তিতে এ সম্পত্তি লাভ হবে। এভাবে একই ধরনের সামাজিক আইনের সমর্থকগণ মুসলমানদের হারাম খেতে বাধ্য করাতে চায়।

ইন্ডিয়ান সাকশেসন অ্যাক্ট

একই ধরনের সামাজিক আইনের কাঠামো সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পেশ করার জন্য উপরে হিন্দু কোডের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু যদি কেউ এ ব্যাপারে জোর দিয়ে বলেন যে, একই ধরনের সামাজিক আইনকে হিন্দু কোডের সাথে তুলনা করা ঠিক নয়, তাহলে বলবো, ১৯২৫ সালের ইন্ডিয়ান সাকসেশান অ্যাক্ট

(Indian Succession Act. 1925) এবং ১৯৫৪ সালের স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্টের (The Special Marriage Act. 1954) আয়নায়ও একই ধরনের সামাজিক আইনের প্রতিবিম্ব দেখা যেতে পারে।

ইন্ডিয়ান সাকসেশান এ্যাক্ট মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ও শিখ সম্প্রদায়কে বাদ দিয়ে অবশিষ্ট সকল নাগরিকের জন্য সমানভাবে প্রবর্তিত আছে। এই আইনে মীরাসের যে নিয়ম-ধারা বর্ণনা করা হয়েছে তা সংক্ষেপে নিম্নরূপ ঃ

১) অসিয়তের উপর কোনো বিধি-নিষেধ নেই। কোনো ব্যক্তি নিজের সম্পত্তির জন্যও অসিয়ত করতে পারে। (Section 59)

২) যদি মৃত ব্যক্তি অসিয়ত না করে গিয়ে থাকে এবং তার উত্ত রাধিকারীদের মধ্যে সন্তানাদি ও বিধবা জীবিত থাকে তাহলে বিধবা এক-তৃতীয়াংশ এবং সন্তানাদি দুই-তৃতীয়াংশ লাভ করবে। (Section 33 to 43)

৩) যদি তার সন্তানাদি না থাকে, তাহলে বিধবা এক-দ্বিতীয়াংশ এবং অবশিষ্ট অংশ অন্যান্য আত্মীয়রা লাভ করবে।

৪) যদি তার স্ত্রী জীবিত না থাকে, তাহলে তার সমগ্র সম্পত্তি সন্তানদের মধ্যে বন্টিত হবে। যদি সন্তানাদি না থাকে, তাহলে অন্যান্য আত্মীয়দের মধ্যে বন্টিত হবে। আর যদি কোনো আত্মীয়ও না থাকে, তাহলে রাষ্ট্র তার উত্তরাধিকারী হবে।

৫) স্বামী ঠিক ততটুকু অংশ পাবে যতটুকু স্বামীর সম্পত্তিতে তার বিধবা লাভ করতো।

৬) সন্তানদের মধ্যে সমানভাবে অংশ বন্টন করা হবে। অর্থাৎ ছেলে ও মেয়ের অংশ সমান হবে।

৭) সন্তানদের মধ্যে যদি কেউ মারা গিয়ে থাকে, তাহলে তার অংশ

বের করা হবে এবং তা নাতি ও নাতনি লাভ করবে।

৮) যদি মৃত ব্যক্তির সন্তানাদি না থাকে, তাহলে বিধবা স্ত্রীর অংশ বের করার পর সম্পত্তি নিম্নোক্তভাবে বন্টিত হবে ঃ

ক) যদি বাপ বেঁচে থাকে, তাহলে সে সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে।

খ) যদি বাপ বেঁচে না থাকে, তাহলে মা, ভাই ও বোনের মধ্যে সম্পত্তি সমান সমান ভাবে বন্টিত হবে।

এই এ্যাক্টও ইসলামের মীরাস আইন থেকে মূলগতভাবে বিভিন্ন। ইসলাম মাত্র সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ অসিয়ত করার অধিকার দান করেছে। কিন্তু উল্লেখিত আইন সমগ্র সম্পত্তি অসিয়ত করার অধিকার দান করে। ইসলাম মেয়ের অংশ ছেলের অর্ধেক নির্ধারিত করেছে। কিন্তু এই এ্যাক্টে উভয়ের অংশ সমান করে দেয়া হয়েছে। ইসলাম সন্তানের বর্তমানে স্ত্রীকে এক-অষ্টমাংশ দিয়েছে এবং সন্তানের অবর্তমানে স্ত্রীকে দিয়েছে এক-চতুর্থাংশ। কিন্তু এই আইন স্ত্রীর অংশ এক-তৃতীয়াংশ এবং সন্তান না থাকলে এক-দ্বিতীয়াংশ নির্ধারিত করেছে। অনুরূপভাবে স্বামীর জন্যও এক-তৃতীয়াংশ এবং সন্তান না থাকলে এক দ্বিতীয়াংশ নির্ধারিত করেছে অথচ ইসলামের মীরাস আইনে সন্তান না থাকলে স্বামীর অংশ এক-দ্বিতীয়াংশ এবং সন্তান থাকলে এক-চতুর্থাংশ নির্ধারিত করা হয়েছে।

ইসলাম সন্তানাদি বর্তমান থাকলে পিতা-মাতাকেও অংশ দিয়েছে কিন্তু উল্লেখিত এ্যাক্ট সন্তান বর্তমান থাকলে পিতা-মাতাকে মীরাস থেকে বঞ্চিত করেছে।

এ দৃষ্টান্তগুলি থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, যদি ইন্ডিয়ান সাকসেশন অ্যাক্ট ১৯২৫ একই ধরনের সামাজিক আইনের (Uniform Civil Code) স্থান দখল করে, তাহলে মুসলমানদের সমগ্র মীরাস ব্যবস্থাই ওলট পালট হয়ে যাবে এবং তাদের মাথার উপর এমন একটি

আইন চেপে বসবে, যা মূলগতভাবে শরীয়তের সাথে সংঘর্ষশীল এবং হক-ইনসাফের পরিপন্থী।

স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্ট

১৯৬৪ সালের স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্ট অনুযায়ী যেকোনো নারী ও পুরুষ বিয়ে করতে পারে, তবে শর্ত হচ্ছে এই যে, ম্যারেজ অফিসারের সম্মুখে তাদের একথা ঘোষণা করতে হবে যে, তারা এই এ্যাক্ট অনুযায়ী বিয়ে করছে আর তাদের এ ঘোষণা যথারীতি লিখিত আকারে হতে হবে।

এই অ্যাক্টের শরীয়ত বিরোধী বিশেষ দফাগুলি নিম্নরূপ ঃ

১) এক স্ত্রীর বর্তমানে দ্বিতীয় বিয়ে কার অপরাধ গণ্য হবে এবং এর শাস্তি হচ্ছে সাত বছরের কারাদণ্ড।

২) চাচাত ভাই, ফুফাত ভাই, খালাত ভাই ও মামাত ভাইয়ের সাথে বিয়ে নিষিদ্ধ।

৩) তালাকদানের ক্ষমতা একমাত্র আদালতের। স্বামী বা স্ত্রী কেউ তালাক দিতে চাইলে এ্যাক্টে উল্লেখিত কারণসমূহের মধ্যে যে কোনো কারণের ভিত্তিতে আদালতে তালাকের আবেদন করতে পারে।

৪) যদি স্বামী ও স্ত্রী দুজনই বিচ্ছেদ চায় তাহলেও তাদেরকে আদালত থেকে তালাক গ্রহণ করতে হবে।

৫) বিয়ের তিন বছর অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে তালাকের কোনো আবেদন পেশ করা যেতে পারবে না।

৬) আদালতের মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছেদের পর এক বছর অতিবাহিত না হয়ে গেলে কোন পক্ষ পুনর্বার বিয়ে করতে পারবে না।

৭) আদালতের মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছেদ হলে যতদিন স্ত্রী দ্বিতীয় বিয়ে করবে না বা তার মৃত্যু হবেনা ততদিন পুরুষকে তার ভরণ-পোষণ

করতে হবে।

৮) যে ব্যক্তি এই এ্যাক্ট অনুযায়ী বিয়ে করবে, মীরাসের ব্যাপারে তার সম্পত্তির উপর ১৯২৫ সালের ইন্ডিয়ার সাকশেসন এ্যাক্ট কার্যকরী হবে।

মুসলমানদের ভূমিকা

হিন্দু কোড, ইন্ডিয়ান সাকসেশান এ্যাক্ট ও স্পেশাল ম্যারেজ এ্যাক্টের, সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা থেকে কতিপয় বিষয় অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এক) এই তিনটি এ্যাক্টের পিছনে যে মানসিকতা কাজ করছে একই ধরনের সামাজিক আইনের পিছনেও সেই একই মানসিকতা কাজ করবে। দুই) যে মানসিকতা একের পর এক করে তিনিটি শরীয়ত রচনা করেছে সেই একই মানসিকতা একই ধরনের সামাজিক আইনের (Uniform Civil Code) নামে আর একটি চতুর্থ শরীয়ত রচনা করতে পারে। তিন) পারিবারিক সমস্যাবলী সম্পর্কে সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণী আধুনিক সভ্যতা প্রবর্তিত ধারায় চিন্তা করে। চার) উপরে বর্ণিত তিনটি আইনে আধুনিক মতবাদ ও মনোভাব সক্রিয়। পাঁচ) এইসব বিষয়ের উপস্থিতিতে একই ধরনের সামাজিক আইন সম্পর্কে অনুমান করা মোটেই কঠিন নয়। এর চেহারা সম্পূর্ণ সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। এটি আসলে উপরোল্লিখিত তিনটি এ্যাক্টের প্রতিচ্ছবি হবে।

অতঃপর একজন মুসলমান যে, ইসলামকে আল্লাহর অবতীর্ণ দ্বীন বলে স্বীকার করে এবং মুসলিম পার্সোনাল ল'কে শরীয়তের গুরুত্বপূর্ণ অংশরূপে মানে সে কেমন করে মুসলিম পার্সোনাল ল'-এর বিরোধী এবং একই ধরনের সামাজিক আইনের সমর্থক হতে পারে? সে মুসলিম পার্সোনাল ল'-এর মধ্যে এমন কোনো পরিবর্তনের সমর্থকও হতে পারেনা, যা কোরআন ও সুন্নাতের উদ্দেশ্য বিরোধী এবং নিছক আধুনিক সভ্যতার দাবী পুরণ করার উদ্দেশ্যে করা হয়।

আল্লাহর প্রতি হাজার শোকর, এ ব্যাপারে মুসলিম জনমত বেশ সচেতন। তারা মুসলিম পার্সোনাল ল'-এর মধ্যে কোনো প্রকার পরিবর্তনকে গ্রহণ করে নিতে প্রস্তুত নয়। উপরন্তু যে মুসলিম মহিলাদের সম্পর্কে মুসলিম পার্সোনাল ল' বিরোধীগণ এই ধারণা দেবার চেষ্টা করছেন যে তাঁরা শরীয়তের আইনের প্রতি ভীষণ বিরক্ত এবং তার ঘোর বিরোধী তাঁরাই মুসলিম পার্সোনাল ল' সংরক্ষণের জন্য কর্মক্ষেত্রে ও নেমে এসেছেন। কাজেই তাঁরা বোম্বাই, নাগপুর, নান্দেড়, ফারভানী, হায়দারাবাদ, পুনা। আহমদাবাদ, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, বাঙ্গালোর, কলিকাতা ও কানপুরে বড় বড় সভা সমিতি করে 'মুসলিম পার্সোনাল ল'-এর সমর্থনে জেরা আওয়াজ তুলেছেন এবং বজ্রনির্ঘোষে এ কথা দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রচার করে দিয়েছেন যে, তাঁরা শরীয়তের উপরে পুরোপুরি নিশ্চিন্ত এবং এ আইন তাঁদের জন্য যথেষ্ট।

মুসলিম পার্সোনাল ল'-এর এই গুরুত্ব এবাং এর দ্বীনী মর্যাদা উপরন্তু এর সমর্থনে মুসলমানদের সচেতন জনমতের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, একে খতম করার বা এর মধ্যে পরিবর্তন সাধনের জন্য যে শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে দাবি ওঠানো হোক না কেন, তা কোনোমতেই যথার্থ ও ন্যায়সঙ্গত হতে পারে না। মুসলমানদের কোনো শ্রেণীর পক্ষ থেকে এই ধরনের দাবি শোভনীয় নয়। আর অমুসলিমদের ব্যাপারে বলা যায়, তাঁরাও যদি মুসলমানদের সমস্যাবলী অনুধাবন করার চেষ্টা করেন, তাহলে তাঁরা মুসলমানদের সাথে উদার ব্যবহার করতে প্রস্তুত হবেন এবং মুসলিম পার্সোনাল ল' সম্পর্কে মুসলমানদের ভূমিকার ব্যাপারে কোনো প্রকার কু-ধারণায় প্রশ্রয় দেবেন না বরং এটিকে তাদের ধর্মীয় দায়িত্বের পর্যায়ে ফেলবেন। অনুরূপভাবে সরকারকেও মুসলমানদের ভূমিকা যথাযথভাবে অনুধাবন করার চেষ্টা করতে হবে। মুসলিম পার্সোনাল ল' সম্পর্কে এমন কোনো পদক্ষেপ নেয়া সরকারের উচিত নয়, যা দ্বীন ইসলামের উপর হস্তক্ষেপের নামান্তর। বরং তাঁদের সর্বাধিক পরিমাণ ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার প্রমাণ পেশ করে দেশ গণতন্ত্রকে

শক্তিশালী ও সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

সংস্কারের যথার্থ পদ্ধতি

এ কথা অনস্বীকার্য যে, দ্বীন ইসলামের দিক থেকে মুসলিম সমাজে যে পরিমাণ অবনতি দেখা দিয়েছে তার ফলে তার সামাজিক জীবনেও অনুরূপ পরিমাণ গলদ সৃষ্টি হয়ে গেছে। স্বামী-স্ত্রীর অধিকার পুরোপুরি আদায় করে না এবং স্ত্রীও স্বামীর অধিকার পুরোপুরি আদায় করে না। পরিচালক হবার কারণে ইসলাম পুরুষকে যেসব ক্ষমতা-ইখতিয়ার দান করেছে সেগুলির অসদ্ব্যবহারও হয়েছে। কিন্তু এ জন্য ইসলাম ও তার শরীয়তকে কোনোক্রমেই দায়ী করা যায় না। বরং এ জন্য সমাজের ব্যক্তিবর্গই পূর্ণতঃ দায়ী। কারণ ইসলামের শিক্ষবলীকে কার্যকরী না করার কারণেই আসলে এই পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। তাই এর চিকিৎসার জন্য উল্টো পথে অগ্রসর হওয়া কোনোক্রমেই যথার্থ ও ন্যায়সংগত হতে পারে না। যাবতীয় বিকৃতির জন্য শরীয়তের আইনকে দায়ী করে অশরীয়তী আইনকে তার সংস্কারের মাধ্যমে পরিণত করা মোটেই সঙ্গত হবে না। বর্তমানে মুসলমানদের জীবনে এমন কোনো বিভাগ আছে কি যেখানে বিকৃতির অনুপ্রবেশ ঘটেনি? যদি প্রত্যেকটি বিকৃতির দায়িত্ব শরীয়তের ঘাড়ে চাপানো যায়, তাহলে ইসলামকেই বিদায় জানাতে হবে এবং আধুনিক সভ্যতার মাধ্যমেই প্রত্যেকটি রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। ইসলামের প্রতি এই অবিশ্বাস এবং আধুনিক সভ্যতার প্রতি এই প্রগাঢ় বিশ্বাস বিষকে অমৃত ও আবেহায়াত মনে করার নামান্তর ছাড়া আর কী হতে পারে?

আসলে মুসলিম সমাজের সংস্কার সাধন করতে হলে মুসলমানদের মধ্যে খোদাভীতি সৃষ্টি করা, তাদেরকে ইসলামের শিক্ষাবলী সম্পর্কে অবহিত করা, তাদের নৈতিক অনুভূতি জাগ্রত করা এবং তাদের মধ্যে জীবনোদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা প্রয়োজন। এর ফলে তারা ইসলামকে জীবনব্যবস্থা হিসাবে গ্রহণ করতে পারবে এবং জীবনের

প্রত্যেকটি বিভাগে তার যথাযথ আনুগত্য করতে সক্ষম হবে। কিন্তু এই সঙ্গে এ প্রয়োজনও অস্বীকার করা যেতে পারে না যে, সমাজের বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শরীয়তের আইন কী পর্যায়ে কার্যকরী হচ্ছে তা পর্যালোচনা করে দেখতে হবে। বিশেষতঃ মেয়েরা যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হচ্ছে তাকে সম্মুখে রেখে তালাক, খুলা প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা কার উচিত এবং তাদের সংকট নিরসনের উপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ করা একান্ত জরুরি। যদি অবস্থা ও পরিবেশের প্রেক্ষিতে শরীয়তের উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে উদ্ভুত সমস্যাবলীর সমাধান চিন্তা করা যায় এবং সেই অনুযায়ী বিধিবিধান প্রণয়ন করা যায়, তাহলে ইসলামে অবশ্য এর অবকাশ আছে। কিন্তু এ কাজটি সাধারণ পর্যায়ের যে কোনো লোকের করণীয় নয়। আর যারা আধুনিক সভ্যতার বাহ্যিক চাকচিক্যে মুগ্ধ-বিমোহিত ও মাথা নত করে তার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নেয় এবং যাদে উপর রাজনৈতিক সুবিধাবাদ প্রতিপত্তি বিস্তার করেছে তারাও এ কাজ করার যোগ্যতা রাখে না। এ ধরনের লোকেরা 'ইজতিহাদ' শুরু করে দিলে শরীয়তের চেহারাই বিকৃত করে দেবে। এ দায়িত্ব তাঁরাই সম্পাদন করতে পারেন যাঁরা দ্বীনের ব্যাপক ও বিস্তারিত জ্ঞান রাখেন এবং তার দৃঢ় রহস্যসমূহ অনুধাবন করতে সক্ষম, যাঁরা সততা, ন্যায়পরয়ণতা ও খোদাভীতির জীবনযাপন করেন এবং যাঁরা বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কেও পুরোপুরি অবহিত। আল্লাহর অনুগ্রহে এই ধরনের জ্ঞানী, পণ্ডিত ও বিজ্ঞ লোকেরা এ বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি দিচ্ছেন এবং সামষ্টিকভাবে এ পথে চিন্তা ও গবেষণার কাজ শুরু হয়ে গেছে। আশা করা যায়, এভাবে উপস্থিত সমস্যাবলী সমাধানের যথার্থ ও উপযোগী পথের সন্ধান পাওয়া যাবে।

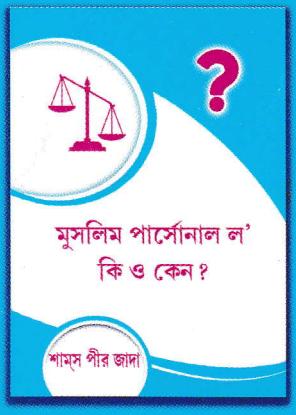

বাংলা ইসলামী প্রকাশনী ট্রাস্ট
কলকাতা-১৩